প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যাঃ চিন্তা ও রাষ্ট্রকে ফিরিয়ে আনার একটি প্রচেষ্টা

হিমাংশু ঝা

২৯ মার্চ, ২০২১

ভারতের শাসনপদ্ধতি অনেক হালফিলের সময় পর্যন্ত গোপনীয়তার আড়ালে ঢাকা ছিল। অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টস ১৯২৩ (ওএসএ), সিভিল সার্ভিসেস কন্ডাক্ট রুলস (১৯৬৪), ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট (১৮৭২)-এর ১, ২ আর ৩ ধারা এবং ভারত সরকারের নির্দেশাবলী ও বিভিন্ন দপ্তরের কার্যপ্রণালীর মত ঔপনিবেশিক সময়ের স্মৃতিবাহী সমস্ত নিয়মকানুন দিয়েই দেশের আইনী ব্যবস্থা চালিত হত। ২০০৫ সালে তথ্যের অধিকার আইন বা রাইট টু ইনফর্মেশন অ্যাক্ট (আরটিআইএ) প্রচলনের হাত ধরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই আইন যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে প্রচলিত গোপনীয়তা পালনের নিয়ম থেকে সরে এসে তথ্যকে জনসমক্ষে হাজির করে এবং এর সাহায্যেই ভারতীয় নাগরিকরা সরকারি তথ্য জানার আইনী অধিকার লাভ করেন। এই প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

এই প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন কেন এবং কি ভাবে ঘটেছে তা বোঝানোর জন্য আমার লেখা *ক্যাপচারিং ইনস্টিট্যুশনাল চেঞ্জঃ দ্য কেস অফ দি রাইট টু ইনফর্মেশন অ্যাক্ট 2005* বইতে আমি একটি ঐতিহাসিক প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেছি। এই বদলের কারণ হিসাবে যে আখ্যানগুলি অন্য সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে সেগুলি জোর দেয় গণআন্দোলনের আনুষঙ্গিক ভূমিকা, অনুকূল রাজনৈতিক শাসনকালে তৈরি হওয়া নানা রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা বা বাছাই করা মানুষদের মধ্যে এক ধরনের পারস্পরিক সংযোগের নিবিড় যোগসূত্রের উপর। এই আখ্যানগুলিকে অতিক্রম করে আমি যুক্তি দিয়ে আলোচনা করেছি যে, ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পর থেকেই রাষ্ট্রের অন্তরে মন্থরগতিতে দীর্ঘকাল ধরে "ভাবনার" উত্থানের যে ধারা বয়ে এসেছে তারই ফলাফল আরটিআইএ। আমি সোশ্যাল নেটওয়ার্কের (সমাজকর্মী, সাংবাদিক, আইনজীবি, শিক্ষাবিদ, কর্মরত ও প্রাক্তন আমলাদের মিশ্রণে তৈরি) সারবত্তাও স্বীকার করেছি। তবে, আমি রাষ্ট্র আর ভাবনাকে এই স্বাভাবিক শৃঙ্খলের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যামূলক সংযোগ হিসাবে ফিরিয়ে এনেছি;, মূলধারার আখ্যানে অনুপস্থিত বলেই এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ আরো বেশি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই পদ্ধতিটিকে একটি "পরিবর্তনের বহুস্তরী বিন্দু" বা "লেয়ারড টিপিং পয়েন্ট" নকশার মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাজনৈতিক ভাবনার ক্রমশ বাড়তে থাকা শক্তির মধ্যে দিয়ে ধীরগতিতে এগিয়ে চলা একটি দৃঢ় এবং আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার তুঙ্গবিন্দুই হল বদলের এই মুহূর্তটি। নানা স্তর তৈরি হওয়ার ফলে, প্রতিষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর চরম সীমায় পৌঁছে একটি নতুন নিয়মের জন্ম হয় এবং তা ক্রিটিকাল মাস আয়ত্তে আনে বা যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের সমর্থন অর্জন করার ফলে বর্তমান স্থিতাবস্থাকে নষ্ট করে দেয়। এই ভাবে ওই প্রতিষ্ঠান ক্রমশ জীর্ন হয়ে ক্ষয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে, স্তরগুলি দুটি পর্যায়ে তৈরি হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ঃ ১৯৪৭-১৯৮৯

প্রথম পর্যায়ে, প্রকাশ্যে আনার ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিল গোপনীয়তার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বন্দোবস্তের অভ্যন্তরেই। সরকারী পরিষদের প্রতিবেদনে, বিচারবিভাগে এবং আরো স্বচ্ছতার জন্য বিরোধীদলের দাবিকে ঘিরে ভাবনা বেড়ে উঠেছিল।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, স্বাধীনতার পর থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারী পরিষদের প্রতিবেদন (যেমন, ১৯৫৩ সালের অ্যাপলবি কমিটির প্রতিবেদন, প্রেস ল এনকোয়ারি কমিটি ১৯৪৮, সান্থানাম কমিটি ১৯৬৪, দেশমুখ স্টাডি টীম ১৯৬৮ আর ১০৭১ সালের ল কমিশনের তেতাল্লিশতম প্রতিবেদন) এই বহুলপ্রচলিত গোপনীয়তাকে প্রশ্ন করে আরো স্বচ্ছতার পক্ষে সওয়াল করেছে এবং সরকারী কার্যকলাপ যথাসম্ভব খোলাখুলি হওয়ার জন্য সুপারিশ করেছে।

লক্ষণীয়ভাবে, বিরোধীপক্ষের একটি দাবীর কারণেই ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ বা লোকসভার অধ্যক্ষ বা স্পিকার (হুকুম সিং) একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দেন। এই রায় অনুযায়ী, রাজনৈতিক বিশ্বাসের দিক থেকে যে দলের সঙ্গেই যুক্ত থাকুন না কেন, লোকসভার সদস্যরা যেকোন গুহ্য নথি থেকে অবাধে উদ্ধৃতি ব্যবহার করার সংসদীয় অধিকার পাবেন। এই নীতিগত পদক্ষেপটি বিরোধীদলের সদস্যদের উদ্যমে স্বচ্ছতাকে ঘিরে যে "চিন্তা" শুরু হয়েছিল তারই উপসর্গ।

ভারতীয় সংবিধানের ধারা ১৯ ১ (ক) যা ভারতের নাগরিকদের বাকস্বাধীনতার মৌলিক অধিকার দিয়েছে সেই ধারাটি নিয়ে কাজ করার সময় এই দেশের বিচারবিভাগও স্বচ্ছতা সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ধারণা ব্যক্ত করেছে। এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতে, একটি গণতন্ত্রে তথ্যের সম্প্রচার এবং বাকস্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের মধ্যে একটি পরিষ্কার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে।

স্বচ্ছতা সম্বন্ধীয় সদ্যজাত ধারণাগুলি যেমন রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই উঠে এসেছিল, তেমনই গোপনীয়তা পালনের সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীগুলি তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই রায়ের কয়েক মাস পরেই, সরকারী তথ্য প্রকাশ্যে আসা বন্ধ করার জন্য একটি বার্তা সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে পাঠান হয়। পরে, ১৯৬৭ সালে, ওএসএ-কে সংশোধন করে আরো জোরালো করে তোলা হয়।

১৯৭৭ সালে, যখন জনতা পার্টির (বিভিন্ন বিরোধী পক্ষের মোর্চা) হাত ধরে বিরোধী পক্ষ ক্ষমতায় আসে তখন, রাষ্ট্রের কার্যকলাপে আরো বেশি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়। ১৯৭৭ সালে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিং, ওএসএ সংশোধন করে সরকারী তথ্য জনসমক্ষে আনা যায় কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করেন। এই পদক্ষেপটিই, ক্ষমতাসীন দলের দিক থেকে এই সমস্যা সমাধানের নীতি নির্মানের জন্য প্রথম প্রচেষ্টা ছিল। তবে, মূলত সরকারী আমলাদের দিয়ে গঠিত এই পরিষদ, কোনো রকম সংশোধন ছাড়াই ওএসএ বজায় রাখার সিদ্ধান্তে আসে। গোপনীয়তা পালনের প্রথা এমনই গভীরে ঢুকে গেছিল যে যখন বিরোধী পক্ষ ক্ষমতায় আসে তখনও এই রীতিতে কোন বদল আনা সম্ভব হয় নি।

জনতা পার্টির পরবর্তী অধ্যয়ে, স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন ভাবনাচিন্তাগুলি প্রান্ত থেকে সরে এসে নীতিনির্ধারনের মূলমঞ্চে প্রবেশ করতে শুরু করে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নানা প্রতিবেদনের সুর ও বিষয়ের মধ্যে এই ঘটনার প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন, ইন্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ১৯৮০-৮২ সালের প্রতিবেদনের সময়, ইন্ডিয়ান ল ইনস্টিট্যুট এবং দ্য প্রেস কমিশন, ওএসএ-র ৫ ধারাকে সরিয়ে, তার জায়গায় নাগরিকদের রাষ্ট্রের কার্যকলাপ সংক্রান্ত তথ্য জানার অধিকার দানের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করে। সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণের প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে জনতা পার্টির প্রভাব সংসদেও অনুভব করা যায়। ১৯৭৭ সালের শাসকদল জনতা পার্টির মোর্চার অংশ, লোক দল পার্টির পক্ষ থেকে উচ্চকক্ষ বা রাজ্যসভার একজন সংসদীয় সদস্য বা এমপি, জি.সি. ভট্টাচার্যই প্রথম বাক্‌স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিলটি সংসদে পেশ করেন। ১৯৮৪ সালে, জনতা পার্টির সুব্রামানিয়াম স্বামী নিম্নকক্ষ বা লোকসভায় একই বিল পেশ করেন। লক্ষনীয় যে, এই বিলের সঙ্গে এখনকার আরটিআইএ-র আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। এর সঙ্গে সঙ্গে, ১৯৭৫ সালের *রাজ নারায়ণ মামলা* আর ১৯৮২ সালের *এস. পি.* গুপ্তা মামলার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় বিচারবিভাগও সংবিধানের ধারা ১৯ (এ) সহজাতভাবে জানার অধিকারকে ধারণ করে বলে ব্যাখ্যা করে এই বিষয়ে নিজের অবস্থানকে তীক্ষ্ণতর করে তোলে।

যদিও, সেই স্বাধীনতার সময় থেকেই, রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিতরের নানা বিভাগ থেকেই গোপনীয়তা পালনের এই রীতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠা সত্ত্বেও এর চর্চা বহু দিন ধরেই টিঁকে ছিল। ১৯৮৬ সালে, যাতে যেকোন কমিশনকেই ভারতীয় সংসদের হাতে কোন রকম তথ্য তুলে দিতে অস্বীকার করার অধিকার দেওয়ার জন্য কমিশন অফ এনকোয়ারি অ্যাক্ট, ১৯৫২-এর সংশোধনের প্রচেষ্টা এইরকমই একটি পদক্ষেপ।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ১৯৮৯-২০০৫

দ্বিতীয় স্তরে, স্বচ্ছতা নিয়ে প্রথমদিককার নতুন ভাবনাগুলি ক্রমশ রাষ্ট্রের চিন্তাধারার মধ্যেই যথেষ্ট গুরুত্ব পায় আর আর গতি পেতে থাকে এবং "বিরোধী রাজনীতির" ক্ষেত্র থেকে "মূলধারার রাজনীতিতে" ঢুকে পড়ে। ১৯৮৯ সালের নির্বাচনের ইস্তাহারে উল্লেখ করা রাজনৈতিক আর নীতিগত অঙ্গীকারে, এই বিষয়ে জ্ঞান বাড়িয়ে নিজেদের মধ্যে ঐক্যমত্য হওয়ার জন্য কর্মশালা ও অধিবেশনের ব্যবস্থা করার মধ্যে, আঞ্চলিকস্তরে নানা উদ্যোগ নেওয়া এবং "নাগরিকদের তথ্যের অধিকারকে" সংবিধানের অন্তর্নিহিত মৌলিক অধিকার বলে বিচারবিভাগের ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়েই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অদ্ভুতভাবে, ১৯৯১-৯৬ সালের মধ্যে, কংগ্রেস আমলে, এই ধরনের কাজকর্মে বিরতি পড়ে। কার্যত, ১৯৯৪ সালে কংগ্রেস পার্টি, ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত ম্যানুয়াল অফ ডিপার্টমেন্ট সিকিউরিটি ইনস্ট্রাকশনকে সংশোধন করে নথিপত্রকে ক্লাসিফাই বা ডিক্লাসিফাই ("গোপনতম" বা "টপ সিক্রেট" থেকে "গোপন ও ব্যক্তিগত" বা "কনফিডেনশিয়াল") করার জন্য সরকারী দপ্তরগুলিকে নির্দেশ দেয়। এর ফলে, এই পার্টির হাতেই গোপনীয়তার চর্চা আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। উদারীকরণ বা লিবারালাইজেশনের পরবর্তী সময়ে, শাসকদলের দিক থেকে, তথ্যের অধিকারের ক্ষেত্রে আরো উদার অবস্থান নেওয়ার প্রত্যাশা করাই যেতে পারে।

১৯৯৮ সালের মধ্যে, আগেকার ভাবনাগুলি ক্রিটিকাল মাস অর্জনের অবস্থায় পৌঁছে যায়। প্রাথমিক স্তরে, নীতি নির্ধারণের যে পদ্ধতিগুলির প্রচলন হয়েছিল তা আরো তীব্রভাবে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। সরকারী পরিষদ সংগঠন, আন্তঃমন্ত্রক কার্যনির্বাহী দল এবং তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের সম্ভাবনাকে ক্ষতিয়ে দেখা জন্য মন্ত্রীদল গঠনের মত উগ্র নীতি নির্ধারণ পদ্ধতিগুলি আসলে ওই ভাবনাগুলির সেই তুঙ্গবিন্দুতে পৌঁছনোর লক্ষণ যার ফলাফল, প্রথমে ফ্রিডম অফ ইনফর্মেশন অ্যাক্ট, ২০০৩ আইন জারি হওয়া এবং অবশেষে, ২০০৫ সালে, আরটিআইএ প্রবর্তন। রাষ্ট্রব্যবস্থার অভ্যন্তরেই এই ধারনাগুলি যত গভীরে যেতে থাকে, বিচারবিভাগও, ভারতীয় সংবিধানের ১৯ ১ (ক) ধারাকে সহজাতভাবে "নাগরিকদের জানার অধিকার" বলে ব্যাখ্যা করে নিজেদের অবস্থানকে ততই দৃঢ় করতে থাকে।

উপরন্তু, আন্তর্জাতিক রীতিনীতিগুলিকেও বিবেচনা করা দরকার। কাকতালীয়ভাবে, আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারনের বিষয়টিও এই দেশে ওই নীতি সংক্রান্ত পদক্ষেপের সঙ্গে এক সময়ই ঘটে এবং প্রদর্শন এবং প্রায়োগিক, এই দুই দিক থেকেই দেশীয় ক্ষেত্রে চলতি আলোচনায় তার প্রভাব পড়েছে। যে সময় প্রান্তীয় ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা সংক্রান্ত নতুন নতুন ধারনা উঠে আসছে, সেই সময় এই বিদেশী রীতিনীতিগুলি চৌহদ্দির বাইরেই রয়ে গেছিল। তবে, ১৯৮৯ সালের মধ্যেই, প্রান্তিক ধারণাগুলি মূলধারায় এসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক নীতিগুলিকেও আভ্যন্তরীণ নীতিনির্ধারণ প্রণালীর মধ্যে টেনে নেওয়া হয়।

এই গবেষণা রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিতরে, চিন্তার ক্রমশ বাড়তে থাকা কার্যকারণ সম্পর্ককে দীর্ঘায়িত, বহুস্তরী প্রক্রিয়া হিসাবে দেখায় যে প্রক্রিয়া গোপনীয়তার চর্চা থেকে স্বচ্ছতার দিকে চলার মত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ধারণা গঠনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। পরিবর্তন আনার আগ্রহে নিচের তলা থেকে সংঘবদ্ধ ভাবে উপরমহলকে চাপ দেওয়ার মত কাজের ভূমিকাকে যে যুক্তি প্রাধান্য দেয়, এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তাতে সমস্যা দেখা দেয়। সংঘবদ্ধ চাপের বদলে, এই বইটি একটি আদর্শগত বৈশিষ্টের দিকে ইঙ্গিত করে। এছাড়াও বইটি দাবি করে যে, সেই স্বাধীনতার সময় থেকে যে চিন্তাগুলি তৈরি হচ্ছে, দীর্ঘকাল ধরে তার জমে ওঠা চাপের কারণেই রীতি ও নীতিগুলি একটা স্পষ্ট আকার পাচ্ছে যা পরে আবার রাষ্ট্রের চিন্তা ও বিচারের উপর গভীর প্রভাব ফেলছে। ২০০৫ সালে ,চিন্তার

ক্রমশ বাড়তে থাকা ভার এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রিটিকাল মাসে পৌঁছে যায় যার ফলে রাইট টু ইনফর্মেশন অ্যাক্টের প্রবর্তন হয়। চিন্তার ক্ষমতা এতই বেশি যে, দীর্ঘতম শাসনকাল যাদের সেই কংগ্রেস পার্টি, যারা সেই স্বাধীনতার সময় থেকে স্বচ্ছতার ধারণাকে প্রতিহত করে এসেছে, তারাই, ২০০৫ সালে, তথ্য জানার অধিকারের অনিবার্যতাকে মেনে নেয়। সরকারের নিজস্ব কাগজপত্র, সংরক্ষিত উপাদান এবং নানা সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে লেখা এই বইটি আমাদের বাধ্য করে, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার সময় চিন্তা, রাষ্ট্র, ইতিহাস এবং আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকে আরো বেশি গুরুত্ব দিতে।

হিমাংশু ঝা হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়া ইনস্টিট্যুটের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের লেকচারার ও গবেষক। তিনি *ক্যাপচারিং ইনস্টিট্যুশনাল চেঞ্জঃ দ্য কেস অফ দি রাইট টু ইনফর্মেশন অ্যাক্ট 2005* (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০২০) বইটির লেখক।